ভোরের কাগজ
ঢাকা শুক্রবার ২১ ভাদ্র ১৪২১ ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪
www.bhorerkagoj.net
ই-মেইল : bkagojliterary@gmail.com

জন্মভূমিকে মাতৃরূপে দেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথের চিত্তও স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয় ভাবের বিকাশ ঘটে।' কবি আত্মার এক বিশেষ স্থান ছেড়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের জন্য। পরবর্তীকালে বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় এর বিকাশ ঘটে বহুলভাবে

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাংলাদেশ

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

সাহিত্যিক, কবি এবং শিল্পী-মানুষের চেতনালোক সবার চেয়ে প্রাগ্রসর। তাঁরা সর্বকালেই সমস্ত চৈতন্য এবং অনুভূতির পুরোভাগে থাকেন। যেমন বর্ণ বৈচিত্র্যকে তারা অনুভব করেন, তেমনি মানুষের অস্থিরতা, যন্ত্রণা, আগ্রহ ও প্রশান্তিকে তাঁরা সহজেই উপলব্ধি করেন। এভাবেই তাঁরা একটি জাতির চূড়ান্ত সচেতনতাকে বহন করে থাকেন। অন্যান্য আর সবার মতো একজন কবির প্রাণকেও ধারণ করে সীমাবদ্ধ আয়তনের কোন না কোন দেশ বা প্রদেশ– যা তাঁর স্বদেশভূমি। 'প্রাণ ধারণের দেশ ও সময় যাপনের কাল' অন্য আর দশজন সামাজিক মানুষের চেয়ে একজন কবিকে প্রভাবিত করে অধিকভাবে। কবির অন্তরভূমিতে যে বিচিত্র অভিঘাত, তাঁর রূপরেখা যাই হোক না কেন, কবি মননের একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে থাকে কবির স্বদেশভূমি। সুতরাং সঙ্গতভাবেই একজন কবি অন্তরের অনুভবলব্ধ বিপুলতা নিয়েই স্বাদেশিক। রবীন্দ্রনাথে আমরা এই অনুভব ও প্রকাশের চিত্র বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করি।

উনিশ শতকের রবীন্দ্রপূর্ব যুগের বাঙালি কবি সাহিত্যিকবৃন্দও জাতীয়তাবাদী চিন্তা এবং জীবনের বিপুল প্রসারী অমঙ্গলকে তাঁদের স্নায়ু এবং মর্মে অনুভব করেন। এই মানসিকতা মূলত এই শতকের নবজাগরণের ফসল। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, বাঙালি নবজাগরণ অগ্রসর হয়েছে অত্যন্ত ক্ষীণ প্রবাহে।

বাংলা সাহিত্যে স্বাদেশিকতা ও স্বদেশ প্রীতির ভাবচ্ছবি সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। পরবর্তীকালে রঙ্গলাল, হেম-নবীনের কাব্যেও তাঁর প্রতিফলন দেখা যায় ঐতিহাসিক অনুসঙ্গ বা পৌরাণিক রূপকল্পে। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যেই স্বাধীনচেতা ও স্বদেশপ্রীতির আবেগকল্প অস্থির, উদ্দাম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাম স্বর্ণলঙ্কা আক্রমণ ও বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের উক্তি, রাবণের নিয়তিবোধ এবং বেদনার্থ হাহাকার প্রদীপ্ত ব্যঞ্জনায় অনুরণিত হয়েছে সে যুগের স্বাজাত্যবোধের অহমিকা।

পরবর্তীকালে বঙ্কিম উপন্যাসে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। বাংলা উপন্যাসের প্রথম যথার্থ শিল্পী হিসেবেই নয়, বস্তুত তাঁর একই সৃজনশীল শক্তির নাভীস্থল থেকে উৎসারিত হয়েছে জাতীয়তার বেদমন্ত্র। এদিক দিয়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকও বিস্ময়কর সৃষ্টি। সমকালীন নীল চাষিদের দুর্দশা এবং কুঠি সাহেবদের পাশবিক অত্যাচারের জ্বলন্ত ছবি অঙ্কিত হয়েছে 'নীল দুর্পণ' নাটকে।

সাহিত্যে ঐতিহ্য চেতনার অর্থ কেবল অতীত বা ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জের ব্যবহার নয়। প্রকৃতপক্ষে এর তাৎপর্য হলো সমাজ-সভ্যতা-মানবজাতির দ্বন্দ্বময় চলিষ্ণু জঙ্গম প্রাগ্রসরতার সত্যমূল্য নির্ণয়। অর্থাৎ ঐতিহ্যবোধ কোন বিক্ষিপ্ত চেতনায় সংশ্লেষ নয়, বরং অনুপ্রবিষ্ট জৈবিক ঐক্য সম্পন্ন। রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যেই সর্বপ্রথম ঐতিহ্য চেতনার স্বরূপ লক্ষিত। তিনি ভারতীয় পুরাণের সিদ্ধবস্তুকে ভেঙে চুরে-দুমড়ে স্বচেতনার অন্তর বাস্তবতায় ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মাণ করেছেন।

'মেঘনাদবদ কাব্যে' মধুসূদন রামায়ণের কাহিনীর আখ্যানভাগকে স্বীয় উপলব্ধির রঙে ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন। রাম সেখানে দেব আশীর্বাদপুষ্ট পররাজ্য লোভী মাত্র। পক্ষান্তরে মধুসূদন রাবণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন সমকালীন মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে; অন্যায়ের বিপক্ষে বৈপ্লবিক প্রতিরোধ। বস্তুত পক্ষে, রাবণের অমিত তেজ, বিপুল ঐশ্বর্য, স্বদেশপ্রেম এবং সর্বোপরি আত্মশক্তিতে সুদৃঢ় আস্থা হিন্দু মধ্যবিত্তের জাগরণের মুহূর্তের আশাদীপ্ত মানস প্রতিরূপ।

একইভাবে প্রকৃতি, বিশেষত এদেশের প্রকৃতি বারবার কবিতায় বিষয়বস্তু হয়েছে তৎকালীন কবিদের। প্রকৃতি এক্ষেত্রে পটভূমি বা বিভাব মাত্র। বিহারীলালের হাতেই প্রথম চেতনার প্রকৃতি নির্মিত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম স্বীয় মানসিকতায় গড়ে নেন প্রকৃতি ও বস্তুজগত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা এবং বাঙালিকে বিশ্বের সামনে যেভাবে সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন, তেমন ভাবে বাংলাদেশকেও বাঙালির চোখের সামনে তুলে ধরেছেন নবতর ও মহত্তম মহিমার রঙ্গে রাঙিয়ে। তাঁর কাব্যে এবং জীবনে ঘটেছে বাংলাদেশের পুনরুজ্জীবন। তিনিই আমাদের স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তী। বাংলাদেশের বৈষয়িক সম্পদই মাত্র নয়, এর প্রাণ ও প্রাণ প্রবাহের যে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ সেটাও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। 'শ্যাম বনানীর উদার প্রান্তর', পদ্মা-মেঘনা ও যমুনা নদীর পরিবেস্টনে প্রকৃতি অপার সৌন্দর্য ও পর্যায়ক্রমিক ঋতুচক্রের হাজারো রঙের বাংলাদেশ যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়। বাংলাদেশকে কবি তাঁর কবিতায় বিছিয়ে দিয়েছেন রজনীগন্ধার মতো থরে বিথরে।

'দেশ মাতৃকার যে গাছপালা, মাটি জল আকাশ
গ্রাম লোক-সংখ্যার সমষ্টি মাত্র নহে, এর অন্তরালে
তার যে চিরন্ময়ী রূপ আছে, আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি
হাজার বৎসর সুখদুখ বেদনা ইতিহাসের ভাঙ্গাগড়া,
উত্থান পতন সমস্ত মিলিয়ে সহস্র পদ্মে সেই চিরন্ময়ী
জননীর পাদপীঠ রচনা করেছেন।'

জন্মভূমিকে মাতৃরূপে দেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথের চিত্তও স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয় ভাবের বিকাশ ঘটে।' কবি আত্মার এক বিশেষ স্থান ছেড়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের জন্য। পরবর্তীকালে বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় এর বিকাশ ঘটে বহুলভাবে। বাংলাদেশের সমস্ত কিছুর সঙ্গে একটা শক্ত সেতুময় যোগাযোগ গড়ে ওঠে। কবির নিজের ভাষায়:

'কি মাটি কি জল, কি গাছ-পালা, কি আকাশ
সমস্তই তখন কথা কহিত। মনকে কখনো
উদাসীন থাকিতে দেয় নাই।'

খণ্ড খণ্ড অনুভূতিই সামগ্রিকতা লাভ করে এবং বাংলাদেশকে একটি বিশেষ কাঠামোতে [illegible] করায়। 'খণ্ড ক্ষুদ্রকে সমষ্টিক সমগ্রতায় উপলব্ধি করার জন্য দৃষ্টি ও মননের যে প্রসার [illegible] অন্যের পক্ষে যা পরিশীলনেও সম্ভব হয় না, রবীন্দ্রনাথে তা অনায়সে লব্ধ।' এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেন–

'The frirst stage of my realization
was through my feeling of in time any
with the nature'

'দেখার শক্তিতে তিনি প্রকৃতি থেকে রস আর মানবজীবন থেকে নিয়েছেন সত্য।' বাংলাদেশকে ও তিনি অনুভব করেছিলেন এই দেখার শক্তি দিয়েই। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য যে সমস্ত আন্তর্জাতিক উপকরণ থাকা দরকার এবং তাঁর প্রকাশকে যেগুলো সম্ভাবিত করে তাঁর উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথে প্রবল। আনন্দে বিষাদে, হতাশায়, নৈরাশ্যে, সুখে, দুখে; প্রতিরোধের স্পৃহায়, প্রতিবাদের প্রয়াসে, প্রতিকারের মানসে কবি বারবার ফিরে এসেছেন বাংলাদেশ ও তার প্রকৃতির কাছে।

'ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আজি যে শ্যামল বঙ্গ দেশে
জয়দেব কবি আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিল দিগন্তের তমাল বিপিনে
শ্যাম ছায়া; পূর্ণমেঘে মেদুর অম্বর।'

অতীতচারী কবি স্মৃতি রোমন্থনে টেনে এনেছেন বাংলাদেশকে। এখানে বাংলাদেশের ঐতিহ্য, আরেক কবিকে স্মরণ করেছেন সমকালের প্রেক্ষাপটে নিজেকে স্থাপন করে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলাদেশের প্রকৃতি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এসেছে। কখনো এই প্রকৃতি তার মনের দুঃখ, বেদনা, কখনো আনন্দ-উল্লাস প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এক অনাবিষ্কৃত নৈরাশ্য ও বিষাদে কবি-দেখেছেন বাংলাদেশের বর্ষাকে–

'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।

>এরপর ১৫ পাতায়

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাংলাদেশ

১৬ পাতার পর >

রাশি রাশি ভারা ভারা
ধানকাটা হলো সারা
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা
কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা।'

নদী বিধৌত বাংলাদেশে চির শুভ্র সৌমরূপ ধরা পরেছে তাঁর সুখ কবিতায়-
'ভেসে যায় তরি
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি। যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে।' [সুখ]
'দুই বিঘা জমিতে' কবির বঙ্গ বন্দনা আন্তরিকতার বিপুলতায় ভরপুর। হতভাগ্য জমি বিতাড়িত নায়কের চোখ দিয়ে কবি নিজেই দেখেছেন শাশ্বত বাংলাদেশকে। এ যেন জননীর প্রতি সন্তানের স্বীকারোক্তি-
'নমো নমো নম, সুন্দরী মম-জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমির, জীবন জুড়ালে তুমি
অবারিত মাঠ, গগন ললাট, চুমে তব পদধুলি
ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলা গেহ
স্তব্দ অতল দিঘি কালোজল নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধু জল লয়ে যায় ঘরে
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।'

রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা' পর্যায়ে বাংলাদেশের চিত্র বহুতর দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্ত করেছেন। এ পর্যায়ে মাতৃভূমিকে স্বর্গের চেয়েও আকর্ষণীয় বলে মনে করেছেন-
মর্ত ভূমি স্বর্গ নহে
সে যে মাতৃভূমি-তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রু জলধারা।
অথবা
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার নদী তীরে
কোনো এক গ্রাম প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে
অশ্বত্থ ছায়ায়

'বঙ্গমাতা' কবিতায় কবি বাংলাদেশকে অনার্য সুলভ অহমিকতা ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন। মায়ের কাছে সন্তান যেভাবে আবদার করে, অনুযোগ করে কবিও বঙ্গভূমির কাছে সে আবদার করছেন বাংলাদেশকে মাতৃজ্ঞান করে-
পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।

বাংলাদেশ কবির একাকিত্বের সঙ্গ হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। ঋতু পরিক্রমায় প্রকৃতি যে ভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় তার সাক্ষাৎ মেলে এখানে-
আজি এই আকুল আশ্বিনে
মেঘে ঢাকা দুরন্ত দুর্দিনে
হেমন্ত ধানের ক্ষেতের বাতাস উঠেছে মেতে
কেমনে চলিব পথ চিনে।
আজি এ দুরন্ত দুর্দিনে

আশ্বিন মাসের বঙ্গ প্রকৃতি কবিকে প্রভাবিত করেছে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ভাবে। শুধু আশ্বিনের ঝড়ই নয়, কবি কালবৈশাখীর প্রচণ্ড লীলাকেও প্রত্যক্ষ করেছেন বাংলাদেশের মাটিতেই। বৈশাখের প্রচণ্ড শক্তি সত্তাকে ডেকেছেন ভৈরব বলে-
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটা জাল,
তপ : ক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
করে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছে এদেশের প্রকৃতি। নব সাজে নতুন ঢং-এ প্রকৃতি তার কাছে ধরা দিয়েছে। মূলত বাংলাদেশের প্রকৃতিকে পছন্দ করেন বলেই কবি এদেশের যান্ত্রিক জটিলতায় ব্যথিত। প্রাণের প্রবাহ খুঁজে পান না কবি এর মধ্যে। তাই বলছেন-
আমি চাই না হতে নব বঙ্গের নব যুগের চালক।
তেমন বাংলাদেশকেই কবি চাইছেন যেখানে-
ওরে শাওন মেঘের ছায়াপড়ে কালো তমাল মূলে
ওরে এপার ওপার আধার হলো কালি নদীরই কূলে
কুঞ্জ বনে নাচে ময়ুর কলাপ খানি তুলে।

বস্তুত 'ক্ষণিকা' পর্যায়ে কবি মননে বাংলাদেশ বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। এ পর্যায়ে অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন কবি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। যেমন 'আষাঢ়' কবিতায় আষাঢ় মাসের প্রকৃতি দেখে কবি রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন। বৃষ্টি পতনের শব্দ কবিকে আলোড়িত করেছে। তাই তিনি ডেকে বলেছেন-
নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউষের খেত জলে ভর ভর
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার।
ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে।
বর্ষার ভরা প্রকৃতিতে কবির প্রাণও নেচে ওঠেছে। তাই কবি গেয়ে ওঠেন- "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ুরের মত নাচেরে।"
কবি হৃদয়ে পেয়েছে ময়ূরের ছন্দ-
'ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা
কূলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।'

বাংলাদেশের সঙ্গে কবির ছিল নারীর সম্পর্ক। এদেশের জন্যে যাঁরা পূর্বে অনুভব করেছেন কবি কৃতজ্ঞতা বশত তাঁদের অভিনন্দিত করেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-
কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেছে আনন্দের হিল্লোল তোমার বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রী দল রুদ্রদ্বার রাত্রি অবসানে।
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে

'পৃথিবী' কবিতায় কবি সমস্ত বিশ্বকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশকেই তিনি চিত্রিত করেছেন।-
বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎ চক্ষু রিদু দিগন্তকে ছিনিয়ে
নিতে এলো
কালো শ্যামল পাখীর মত তোমার ঝড়
অথবা
আবার ফাল্গুনে দেখেছি তোমার অতপ্ত দক্ষিণ
গুড়িয়ে দিয়েছে বিরহ মিলনের স্বগত প্রলাপ মুকুলের গন্ধ
দাদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে...।
শেষ বিদায়ের পরও কবি মানসচক্ষে যে পৃথিবী দেখতে চেয়েছেন, যে জীবনকে দেখতে চেয়েছেন সেটাও বাংলাদেশের। শেষ বিদায়ের দিন কবি যাকে বন্দনা করতে চাচ্ছেন সেও বাংলাদেশ। কারণ বাংলাদেশ কবিকে দিয়েছে আতিথ্যের স্বাদ-
কতকাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে, কভু আম্র মুকুলের গন্ধে ভরা
পেয়েছি আহ্বান বাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর।

মূলত রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার বাংলাদেশকে উপস্থাপিত করেছেন বিচিত্র এবং বিপুলভাবে। তাঁর প্রাণের মূল বাঁধা ছিল বাংলাদেশের তালে। তিনি বাংলাদেশ, তার প্রকৃতি, সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর কবিতাই তার পরিচয় বহন করে। এ প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন তাঁর শিকড় আছে বাংলাদেশের মাটিতে। যখন তিনি সমগ্র ভারতের কথা বলেন তখন তাঁর পা বাংলাদেশের মাটিতেই।' এ কথা থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথের কতটুকু কাছাকাছি ছিল।

কবিতায় বাংলাদেশ যতটুকু প্রস্ফুটিত, রবীন্দ্রনাথের গানে তা আরো বিস্ময়কর রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এত দরদ ও এত নিগূঢ় অনুভব নিয়ে অন্য ভাষায় স্বদেশ বন্দনা আর কোথাও রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশকে উদ্দেশ্য করে এই নিবেদন মূলক গানগুলো রচনা করেছিলেন।
১৮৯৭ সাল 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কবির স্বদেশ প্রেমের বিখ্যাত গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' প্রথম গাওয়া হয়। একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিবাহিনী তখন সমগ্র বাঙালি জাদুস্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, তিনি আমাদের মুক্তি যুদ্ধের এক প্রধান প্রেরণা, পুনর্মূল্যায়িত তাঁর গান আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। এই গানের প্রতিটি ধ্বনি জীবন্ত বাংলাদেশকেই তুলে ধরেছেন।
ধেনু চড়া তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে
মরি হায় হায়রে
ও, মা আমার যে ভাই তারা সবাই, ওমা তোমার রাখাল তোমার চাষা।

স্বদেশী যুগে কয়েক সহস্র গান জাতীয় ভাবপূর্ণ সঙ্গীত বাংলাভাষায় রচিত হয়েছিল। তন্মধ্যে একা রবীন্দ্রনাথের গানই সর্বাধিক। দেশ মাতৃকাকে তিনি যে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন সেই প্রেম সেই স্বর্গই শত সহস্র ধারায় তার গানের মাঝে উৎসারিত হয়েছিল। বাংলাদেশের আলো বাতাস কবিকে বর্ধিত করেছে দৈহিক ও মানবিকভাবে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কবি ও দেশের মাটিকে প্রণাম করেছেন।
সেবার ঐ শ্যামল বরণ কোমল মূর্তী মর্মে গাথা
ও আমার দেশের মাটি তোর পরে ঠেকাই মাথা।
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন কবি। বাংলাদেশ ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে, এটা তিনি কামনা করেননি। দেশমাতৃকার অখণ্ডতাই তাঁর কাম্য ছিল। ১৯০৫ সালের ষোলই অক্টোবর 'রাখী বন্ধন' উৎসবের জন্য রচনা করেন-
বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।
শুধু বাংলাদেশ নয় বাংলার মানুষ অর্থাৎ বাঙালির জন্যেও তাঁর কামনা ছিল--
বাঙালির প্রাণ বাঙালি মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান।
স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে কবি বাঙালির একটি প্রচণ্ড জাগরণ লক্ষ করেছিলেন আর তা দেখে তিনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। একে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি এভাবে-
এবার তোর মরা গাঙে বাণ ডেকেছে জানা বলে ভাসাতরী
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণ পণে ভাই ডাকছে আজি।
বঙ্গভঙ্গ রোধ-এর পর কবি আশাতীত আনন্দিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের তিনি একক মা হিসেবে গণ্য করতেন এবং সমস্ত বাঙালিকে মনে করতেন ভাই হিসেবে। পুনর্মিলনে তিনি লিখলেন-
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।
কবি উত্থান-পতনে সর্বাবস্থায় বাংলাদেশকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করতেন। পরাধীন দেশের কুফলকে প্রতিরোধের স্পৃহা পেতেন বাংলাদেশ থেকেই। চির শান্ত বাংলাদেশ রণ সাজে সজ্জিত হতে দেখে কবি আশাবাদী হয়ে উঠেছেন-
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আখি না ফেরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সেবার মন্দিরে।
তারপর আরো বলছেন--
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাহাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র আগুন বরণ।
অর্থাৎ একই সাথে ভয়ঙ্কর আর শান্ত এই দুটি রূপকেই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন বাংলাদেশে।
মাধুর্যের পুষ্পময় ছোঁয়ায় বাংলাদেশ তাঁর কবিতায় এক বিমূর্ত রূপ ধারণ করেছে-
অয়ি ভুবন মনমোহিনী মা
অয়ি নির্মল ধরনী জননী।
এদেশে কবি জন্মগ্রহণ করে নিজেকে এবং নিজের জন্মকে সার্থক বলে মনে করেছেন। তার এ ধরনের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে নিম্ন কবিতাটিতে-
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।
আর তাই কবি সুখ-দুঃখে, আশা-নিরাশায়, কামনা-প্রত্যাশায় সর্বাবস্থায়ই ছিলেন অবিচল। কবি তাঁর জন্ম জন্মান্তকাল, অনন্তকাল বাংলাদেশেই বেঁচে থাকার বাসনা পোষণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর সুষ্ঠু বক্তব্য-
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না মা।
কারণ--
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা ভুলতে সে যে পারবে না মা।
এভাবেই তিনি বাংলাদেশ অর্থাৎ তার স্বদেশভূমির সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন। নিজের সত্তাকে লীন করে দিয়েছেন বাংলাদেশের মাঝে।
বস্তুত এই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি। একজন দেশপ্রেমিকের মতো অন্তরের তারা উচ্ছ্বাস দিয়ে ভালোবেসে ছিলেন বাংলাদেশকে এবং সে ভালোবাসা প্রকাশও করেছিলেন নির্দ্বিধায় এবং গৌরবের সঙ্গে।